

আমরা চাইলেই সম্ভব

চাচা আপনার ঘর কোন দিকে?

ঘর নাই বাজান। বন্যায় ভাসায় নিছেগি।

আপনার ঘরটা আচ্ছিন কই?

ওই যে সামনে।

একটু দেখাইবেন আমগোরে?

চাচাকে নিয়ে তার ঘরের সামনে যাই। কই এখানে তো কোন ঘর দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে খইখই পানি। সামান্য একটু উঁচু ভিটা জেগে আছে। এখানে যে ঘরটা ছিল জায়গাটা দেখে তা বোঝার কোন উপায় নেই। কাছে গিয়ে ঘরের খুঁটির গর্তগুলো দেখে অনুমান করতে পারলাম যে এখানে আসলেই একটা ঘর ছিল। কিন্তু ঘরের কোন অবশিষ্টাংশ ও এখন নেই। চাচাকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে তার পরিবারের বর্তমান অবস্থা দেখে আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম। তাহিরপুর টাপ্পুয়ার হাওর অঞ্চলের এই বাসিন্দার নাম আমার মনে নেই। তবে তার ছলছল চোখের চাহনি দেখে আমি পরিস্থিতি কিছুটা উপলব্ধি করতে পারলাম। একটু আশ্রয়ের জন্য পাশের উঁচু একটা বাড়ির গোয়ালঘরে মানুষটা নিজের পরিবারের ছয়জন সদস্য নিয়ে উঠেছে।

একই ঘরে তিন - চারটা গরুর সাথে রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া সহ সামগ্রিক জীবন - যাপন চালিয়ে নিতে হচ্ছে।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হলে মানুষ এবং গবাদি পশু একই ঘরে ঘুমাতে পারে তা বোধ হয় আর বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

ততদিন পর্যন্ত আমরা ১৮ হাজার পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করছি। ত্রাণের জন্য দেশবাসী এবং প্রবাসীদের কাছ থেকে আমরা যে অনুদান সংগ্রহ করেছিলাম, তার থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। বন্যার শুরু থেকেই একটা ব্যাপার আমার মাথায় ছিল যে বন্যা চলাকালীন মানুষকে যতটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তার চাইতে ও বেশি ভোগান্তির শিকার হতে হয় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর।

আজকে এই চাচাকে যেভাবে ঘরহারা অবস্থায় দেখলাম, আমি জানি এরকম হাজার হাজার পরিবার ঘরছাড়া হয়েছে বন্যার পানিতে। বন্যা চলাকালীন অনেকে হয়তো কোথাও না কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু পানি নেমে যাওয়ার পর অনেকেই নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখবে যে তাদের মাথা গোঁজার ঠাইটা আর নাই।

এই ঘরহারা মানুষগুলোর জন্য কি করা যায় তা নিয়ে আমরা পুরো টিম মিলে একটা পরিকল্পনা করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা তাদের ঘর বানিয়ে দেব। কিন্তু ঘর বানানোর কাজে আমাদের কারো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।

আমরা আসলে এমন কিছুও করতে চাচ্ছি না যাতে মানুষের দেয়া অনুদানের টাকাগুলোর সঠিক ব্যবহার না হয়। শ্রাবণ বুদ্ধি দিল, যেহেতু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের দুর্ভোগ মোকাবিলায় সবার আগে এগিয়ে আসে তাই সেনাবাহিনীর সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেয়াটাই এই মুহূর্তে উত্তম কাজ হবে। বন্যার শুরু থেকে কাজ করতে করতে এদের মধ্যে আমাদের সাথে সেনাবাহিনী অনেক কর্মকর্তা সু সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তাদের মধ্যে থেকে বন্যায় উদ্ধার কাজে নিয়োজিত সিলেট সেনাবাহিনীর মেজর হাসান ভাইয়ের সাথে দেখা করে আমাদের সকল পরিকল্পনা শেয়ার করি। হাসান ভাই আমাদের জানালেন তিনি সেনাবাহিনী পক্ষ হতে ঘর বানানোর জন্য আমাদের অফিসিয়ালি কোন ট্রেনিং - এর ব্যবস্থা না করতে পারলেও আনঅফিসিয়ালি সব রকমের সহায়তা করতে পারবেন পারবেন।

ভাইয়ের সাথে কথা বলে ভীষণ মানসিক শক্তি এবং সাহস পেলাম। হাসান ভাই অনেকক্ষণ সময় নিয়ে আমাদের ঘর বানানো সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য দিলেন। ঘরের মেজারমেন্ট কেমন হবে, টিনের সাইজ কেমন হবে, বাঁশ এবং কাঠের সাইজ কেমন হবে, পেরেকের সাইজ কতটুকু হবে, কি পরিমাণ পেরেক লাগতে পারে এবং খুঁটির গর্ত কতটুকু গভীর হবে ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দিলেন।

কথাবার্তার শেষে আমি জানতে চাইলাম, এক একটা ঘর বানাতে কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে এবং ঘরগুলো স্থায়ীকাল কেমন হবে।

তিনি জানালেন , একেকটা ঘর কমপ্লিট করতে আট থেকে দশজন মানুষের একটানা ছয় থেকে আট ঘন্টা কাজ করতে হবে এবং ঘরগুলো পাঁচ থেকে সাত বছরের মত টেকসই হবে। যদি আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘরহারা মানুষগুলোর জন্য নতুন ঘর বানিয়ে দিতে চাই তবে এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে বলে ভাইয়া আমাদের জানালেন।

কথা শেষ করে আমি স্কোয়ার্ড লিডারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলাম।

শুরুতেই হিসাব করে বের করলাম, এটা একটা ঘর তৈরি করতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মত খরচ হবে।

মিটিংয়ে কয়েকটি ব্যাপারে আমরা একমত হলাম। যেহেতু খুব দ্রুত মানুষগুলোর ঘর প্রয়োজন , তাই স্থায়ী ঘর বানানোর জন্য সময় নেওয়া যাবে না। তাছাড়া একটা স্থায়ী ঘর বানাতে যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে তা দিয়ে এখন জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটা ঘর বানানো যাবে।

তাই সব ভেবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম , মেজর হাসান ভাই ঘর বানানোর সম্পর্কিত যে তথ্য দিয়েছেন , সেই মতই ৫ থেকে ৭ বছর মেয়াদি ঘর বানানোর কাজ শুরু করব। কয়েকদিন সময় নিয়ে বন্যা কবলিত সিলেট এবং তার আশেপাশের প্রতিটি উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায় থেকে আমাদের মাঠকর্মী দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারলাম , এই অঞ্চলে গুলোতে প্রায় ২০ হাজার পরিবার বন্যায় গৃহহীন হয়েছে ; যাদের সবারই জরুরী ভিত্তিতে ঘর দরকার। এই তথ্য পেয়ে আমাদের মাথায় এরকম আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এত এত ঘর কিভাবে বানাবো আমরা? আমাদের কাছে এই মুহূর্তে যে পরিমাণ টাকা আছে, তা দিয়ে বড়জোর ষাটটি বাড়ি বানানো যাবে। কিন্তু বাকিদের কি হবে?

ভেবেচিন্তে আমি আবার ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সহযোগিতা চাইলাম। এবার আর তেমন কোন সাড়া পেলাম না।

মনে মনে কিছুটা ভেঙে পড়লাম। আমাদের নিজেদের কতটুকুই বা সামর্থ্য আছে। যা করছি , সব তো দেশবাসীর সহযোগিতাতেই করছি। এখন দেশবাসীকে আবার পাশে না পেলে , এই ঘর বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে আমরা বেশি দূর এগোতে পারবো না।

হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এলো। একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শুরু করলাম। যেহেতু এই সিলেটে সারাদেশের মানুষ বছরের বিভিন্ন সময়ে ঘুরতে আসে, সেই মানুষগুলোর তো নিশ্চয়ই সিলেটের প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসার জায়গা রয়েছে।

তাদের যদি কোন ভাবে এই পূর্ণবাসন প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা যায় তবে আমাদের কাজ কিছুটা আগাবে।

কিন্তু কিভাবে যুক্ত করি। এদিকে আমার প্রবল ইচ্ছা , বিভিন্ন সময়ে যারা সিলেটে ঘুরতে আসে তাদের একবারের জন্য হলেও এই জায়গাটায় নিয়ে আসা। আমি মনে করি, ফেসবুক লাইভ এবং গণমাধ্যম দ্বারা দূর থেকে বন্যার পরিস্থিতি দেখা আর সামনে এসে কাছ থেকে দেখার মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে।

এই মানুষগুলোকে যদি আমি এখানে আনতে পারি, তবে কিছু একটা হবে। একটা ট্যুরের প্ল্যান করলাম।

যে ট্যুরটা হবে শুধু বন্যার্তাদের সহযোগিতার জন্য। ট্যুরের প্ল্যানিংটা ছিল এরকম , সারাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যারা এই ট্যুরে অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাদেরকে কয়েকটি রুলস ফলো করে আসতে হবে।

রুলসগুলো হলো , প্রতিটা গ্রুপে অন্তত পাঁচ থেকে দশজন মানুষ থাকতে হবে। অন্তত একটা ঘর বানানোর সমপরিমাণ অর্থ বন্যার্তাদের

পূর্ণবাসনের জন্য অনুদান করতে হবে। তারা চাইলে নির্মাণ সামগ্রী কেনা থেকে শুরু ঘর নির্মাণ করা পর্যন্ত সকল ধাপ আমাদের সাথে থেকে দেখতে পারবেন এবং চাইলে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

প্রতিটা গ্রুপ সিলেট পর্যন্ত নিজ খরচে পৌঁছাবেন। এরপর তাদের সেই পূর্ণবাসন এলাকায় নিয়ে যাওয়া, থাকা - খাওয়া , কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলে নৌকার ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তাসহ সবকিছু ব্যবস্থা আমরা করব।

ফেসবুক লাইভে আমার এই পরিকল্পনা জানানোর মাধ্যমে দেশবাসীকে আহবান জানাই,,

এই ট্যুরে অংশগ্রহণ করার জন্য। শুরুতেই বুঝতে পারছিলাম না ,মানুষ এই প্ল্যানটা কিভাবে গ্রহণ করবে। লাইভের পরের দুই দিনে তেমন কোন সাড়া পায়নি। কিছুটা দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের ফান্ড থেকে আমরা ঘর বানানোর কার্যক্রম শুরু করে দেই। প্রথম দিনেই তৈরি হয় ২৮ টা ঘর। সেদিন আমরা ২৮ তম জন্মদিন ছিল।

এই আকাশটা গৃহহীন পরিবারের মুখের অকৃত্রিম হাসি ছিল আমার জন্মদিনে সবচেয়ে বড় উদযাপন। এরচেয়ে প্রশান্তির উদযাপন আমি আগে কখনো করিনি এবং হয়তো ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।
লাইভের ঠিক তিনদিন পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কল আসতে শুরু করে। অনেকেই বেশ আগ্রহের সাথে আমাদের এই ট্যুরে অংশগ্রহণ করতে চান। সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করি, কারণ আমার প্ল্যানটা কাজে লেগে গেছে।

সারাদেশ থেকে অর্ধশতাধিক গ্রুপ এই ট্যুরে করে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা থাকবে। তবে দুইটা গ্রুপের ঘটনা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যা আমি শেয়ার করতে চাই।
ট্যুর শুরু হলো চট্টগ্রাম থেকে আসা সোয়াদদের গ্রুপ দিয়ে। সোয়াদ তার দুইজন বন্ধুকে নিয়ে বন্যার্তদের জন্য ঘর বানাতে আসে। তারা ৩৫ হাজার টাকা নিয়ে এসেছে। হ্যাংলাপাতলা গঠনের ছেলে। বয়স ১৮ কিংবা ২০ বছর। তাদের নিয়ে সিলেট সদরে টুকের বাজার নামক একটি এলাকায় যাই।
ভোর থেকে আমাদের ঘর বানানোর কাজ শুরু হয়। ওরা তিন বন্ধু সকাল থেকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী দলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। দুপুরের খাবার বিরতির পর সোয়াদের কাছে আমি জানতে চাই, কিভাবে তারা টাকাটা ম্যানেজ করছে।

সোয়াদের বন্ধুরা তার দিকে চোখাচোখি করছে। সোয়াদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে আমাকে বলল।

তাহরিফ ভাই, টাকাটা আমি ম্যানেজ করছি।

কিভাবে ম্যানেজ করলো এত টাকা ?

ভাই, আমি একজন স্টুডেন্ট। আমি ২-৩ বছর ধরে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে সেকেন্ড হ্যান্ড iphone কিনছিলাম। আপনার লাইভ দেখে আমি আইফোনটা বিক্রি করে দিয়েছি।

কি বলছো তুমি ?

জি ভাইয়া। আরো দুইদিন আগেই আসতাম। কিন্তু আমি টাকাটা হাতে পেয়েছি গতকাল রাতে।

সোয়াদের উত্তর শুনে আমি একবারে তাক্তব বনে গেলাম।

এই বয়সের একটা ছেলে এত বড় একটা স্যাফ্রিফাইসের কথা কিভাবে ভাবল ? কি করেই বা করল ? কতটা উদার মানসিকতার মানুষ হলে এই কাজটা করা সম্ভব ! সোয়াদের ঘটনাটা শুনে আমি প্রচন্ড রকমের সাহস পেলাম। শুধু সোয়াদ না, গাজীপুর থেকে আসা সাহস নামের আরেকটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় হয়।

সাহস তার মাকে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে উপহার দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা জমিয়েছিল। সেই টাকা নিয়ে সাহস এই ট্যুরে চলে আসে। সাহসের সাথে কথা বলে জানতে পারি, তার পারিবারিক অবস্থা এতটা স্বচ্ছল না।

সাহসের মা আগে কখনো স্মার্টফোন ব্যবহার করেনি। সাহস তার মাকে ফোনটা উপহার দিতে পারলে যে আনন্দের একটা মুহূর্ত সৃষ্টি হতো আমি তা পুরোপুরি অনুভব করতে পারছি। সেই মুহূর্তটা আমি হারিয়ে দিতে চাই না।

তাই নিজে থেকে অনেকটা জোর করেই আমি সাহসের পকেটে ১০ হাজার টাকা গুঁজে দেই। একটা প্রাপ্তির আনন্দ সাহসের চোখে ছলছল করছিল। আমিও আমার আনন্দ অশ্রু লুকাতে পারিনি।

সাহসকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। প্রচন্ড আনন্দে - গর্বে আমার হাত-পা কাঁপছিল। তীব্রভাবে মনে হচ্ছিল, এই তরুণদের নিয়ে বুক চিতিয়ে গর্ব করা যায়।

এই তরুণদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়। এক সুন্দর আগামী স্বপ্ন। যেখানে মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে। মানুষের দুঃখে মানুষ কাঁদবে। মানুষের খুশিতে হাসবে মানুষ। একদিন এই তরুণরাই তৈরি করবে স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ। তরুণরা এগিয়ে এলে সব সম্ভব। "আমরা চাইলেই সম্ভব"

